International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics (IBJCAL), eISSN: 2582-4716
https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/issue/view/46
VOLUME: VIII, ISSUE: 2 || June, 2026 || Double Blind Peer Reviewed || pp 1-10



International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

Bijan Bhattacharya's *Devigarjan* in the Context of the Gananatya Movement: The Social Reality of Lokayat Life and Class Struggle

গননাট্য আন্দেলনের প্রেক্ষিতে বিজন ভট্টাচার্যের *দেবীগর্জন* : লোকায়াত জীবন ও শ্রেণিসংগ্রামের সমাজবাস্তবতা

সাদিয়া সুলতানা (Sadia Sultana)
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ওয়ার্ল্ড ইনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, Email: sadia.sultana@science.wub.edu.bd

ARTICLE INFO

Article History

Received: 15.02.2026
Revised: NA
Accepted: 20.05.2026
Published: 30.06.2026

Keywords

Ganatya
Marxist consciousness
Santal peasants
peasant revolt
class struggle

ABSTRACT

Bijan Bhattacharya (1906-1978) was one of the architects of the transformation that took place in Bengali drama in the forties of the twentieth century, thanks to the work of the playwright. He wrote, directed and acted in plays believing in Marxist ideology. Therefore, the life-struggle and survival of the peasant-worker-hardworking people became the main theme of his plays. The article under discussion analyzes Bijan Bhattacharya's play Devigarjan using the method of text analysis. The play is a story of the rebellion and rebellion of the Santal farmers of the Birbhum region against exploitation. In this part of India at that time, numerous usurious moneylenders were flourishing on the blood-drained production of the farmers. As a result, class conflict was created, which took the form of the peasant movement. In Devigarjan, the class struggle and protest of the Dalit peasant society was artistically embodied.

CC BY NC

১.০ ভূমিকা

বিশ শতকের গোড়া থেকে ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবীতে জনমত জাগ্রত হতে থাকে। সারা বিশ্বে যখন ফ্যাসিবিরোধী মনোভাব ও কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন এর প্রভাব পড়ে ভারতবর্ষের সাহিত্য- সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে। বাংলা নাট্যসাহিত্যও তার পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ঐতিহ্য থেকে রূপ নেয় গণনাট্যে। যা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'গণনাট্য আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই আন্দোলন শুধু আমাদের নাট্যসাহিত্যের ওপরই প্রভাব বিস্তার করেনি, পাশাপাশি বাংলার আর্থ- সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধে এনে দিয়েছে গণসচেতনতার বিকাশ। মন্দিরা রায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> *'গণনাট্য আন্দোলন' শব্দটি একটি বিশেষ সময়ের সন্ধিক্ষণের দলিল। মঞ্চ- পরিবেশের গতানুগতিকতা যখন বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো- সেই মুমূর্ষু নাট্যঅঙ্গনে একরাশ তাজা বাতাসের সুগন্ধ নিয়ে এসেছিলো এই আন্দোলন। 'গণনাট্যের' অর্থ শুধু জনতা বা গনের নাটক নয়, সেই সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক তথা নাট্যআন্দোলনও বটে।* (রায়, ২০০৪: ৪)

"নতুন গণআন্দোলনের জমিতে গণনাট্য আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসবাদ। ফলে বাংলা থিয়েটার শতবর্ষব্যাপী যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সুরে বাঁধা ছিল, সেখানে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল গণনাট্য আন্দোলন।" (রায়, ২০২১: ৪২)। রাজনৈতিক পটভূমিকায় স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধকরণের ফলশ্রুতিতে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় বাংলা। ১৯৪০- এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ, মন্বন্তরের অস্তিচর্মসার মানুষ, গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক, প্রত্যন্ত সাধারণ মানুষের সমস্যা জর্জরিত জীবনের দুঃখ বিক্ষোভ, সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন দখল করল বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিস্তীর্ণ আকাশ। নাট্যসাহিত্যে ওই সময়ে গণমানুষকে স্থান দেওয়ার প্রত্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'Indian Peoples Theatre Association (I.P.T.A)' বা 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। এই সংঘের প্রতিনিধিত্বকারীরা হলেন- মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, বিনয় ঘোষ, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। সমালোচকের মতে:

> *যুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ, মন্বন্তর, মুনাফাবাজ, কালোবাজারি সবমিলিয়ে এই সময়ে মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পরিস্থিতিতে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি সেসব ভাবনা থেকে মুখ ফিরিয়ে আবেগসর্বস্ব জাতীয়তাবাদ, ব্যাক্তিকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা কিংবা দৈবলীলার ভক্তিভাষ্য নিয়েই মশগুল ছিল। গলিত নীতি, ধর্ম ও দেশাভিমানের তরল আবেগসর্বস্বতার সীমাবদ্ধ গণ্ডিতেই বাংলা নাটকের চর্বিত চর্বন চলছিল। গণনাট্য সংঘ সেখানে নতুন ভাব ও ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিল। বাংলা নাটকের পালাবদল ঘটে গেল।* (চৌধুরী, ২০০২: ১৫৪-১৫৫)

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তাদের ভাবে ভাবনায় চেতনায় ও সংগ্রামে প্রগতিশীল জীবন দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়ে নাটক রচনা ও নাট্য অভিনয় এক যুগান্তকারী সূচনা করেছিল। এই গণনাট্য সংঘের প্রথম শ্রেণির নাট্যকর্মী ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। ১৯৪০- এর দশকে নাট্যজীবনের শুভারম্ভ এবং প্রচলিত বাণিজ্যিক থিয়েটার ধারার বাইরে স্বতন্ত্র নাট্য রচনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এক্ষেত্রে সমালোচকের মতামত প্রনিধানযোগ্য:

> *অভিনয়, নাট্য-প্রযোজনা ও নাট্যরচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সুগভীর সমাজ চেতনা এবং নাটকের মাধ্যমে প্রগতি মূলক চিন্তাধারা প্রসারের প্রচেষ্টাই তাঁহার সব নাটকে লক্ষ্য করা যায়।* (ঘোষ, ২০০৩: ৩৯৭)

২.০ গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী ও উদ্দেশ্য

গণতান্ত্রিক দেশে সামন্তপ্রভু আর পুঁজিপতিদের আধিপত্যে যুগে যুগে নিষ্পেষিত হতে থাকে সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়। সরকারিভাবে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করা হলেও শোষণের রূপ একই থাকে। এই নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেই

দলিত সম্প্রদায়কে তুলে এনেছেন। পাশাপাশি আদিবাসী সমাজের জীবন- প্রণালি, টিকে থাকার লড়াই এবং শোষণের বিরুদ্ধে গণজাগরণ গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের আলোকে নাট্যকারের নাটক পর্যালোচনার ভিত্তিতে আলোচিত হবে। অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মহাজন ও ভূস্বামীদের আগ্রাসন এবং আদিবাসী সাঁওতাল কৃষকশ্রেনির লোকায়াত জীবন-জাগরণ ও শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবন্ধটিকে নির্ধারণ করা যেতে পারে:

ক. গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন।
খ. মহাজন ও জোতদার শ্রেণির শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ।
গ. পুঁজিবাদী সমাজের বিষয়-বৈচিত্র্য চিত্রায়ণ।
ঘ. সর্বহারা শ্রেণির হৃদয় রক্তক্ষরণের স্বরূপ অনুসন্ধান।
ঙ. আদিবাসী জাতিসত্তার সম্মিলিত ঐক্য ও প্রতিরোধ পর্যবেক্ষণ।
চ. সাঁওতাল কৃষকের অন্তর্বাস্তবতার চিত্র বর্ণন।

৩.০ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণা কর্মে MLA (The Modern Language Association of America) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার পাঠ বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক রীতি অবলম্বনে নাট্যকারের গণনাট্য আন্দোলন ও সমাজ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী আগ্রাসনের চিত্র, ফলশ্রুতিতে নিপীড়িত সাঁওতাল কৃষকদের শ্রেণিচেতনার উত্থান এবং পরিণামে কৃষক আন্দোলন ও তার ফলাফল আলোচ্য প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিবিম্বিত এবং কতটা সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ সে বিষয় নির্দেশিত হয়েছে।

৪.০ তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

নবান্নর দু- দশক পরে বিজন ভট্টাচার্য লিখলেন *দেবীগর্জন* নাটকটি। তিন অঙ্কে এগারোটি দৃশ্যের নাট্যকাহিনি অত্যন্ত সুসংহত। এ নাটকের বক্তব্যকেন্দ্র বীরভূম অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চল। কাহিনিতে দেখা যায় যে, বাংলার- প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই আদিবাসী বাউরি সাঁওতাল চাষিদের বসবাস। জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধনের পর মধ্যস্বত্বভোগী প্রভঞ্জন বেনামিতে চাষিদের জমি নিজের তহশীলভুক্ত করে নেয়। পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থা বানচাল করে অবাধ নিষ্ঠুরতায় সামন্ততান্ত্রিক শাসন চালু করে সে। কৃষিঋণ আর কর্জাধানের সুদ যোগাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয় দরিদ্র ভুঁইচাষীর দল। তাদেরই জমির ধানে গোলা ভর্তি হয় প্রভঞ্জনের। আর তারাই থাকে নিরন্ন উপবাসী।

নাট্যকার যে সময়ে *দেবীগর্জন* লিখেছিলেন সে সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে ভারতবর্ষে খাদ্য সংকটের সৃষ্টি করে মজুতদার ও কালোবাজারি শ্রেণি। জমিদার প্রথার জায়গা দখল করলো জোতদার। নগরের মরিয়া জনগণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামে। সাবেকি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বদলে নতুন পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রশ্ন তোলেন বিজন। শ্রেণি বৈষম্যের গণনাট্যসুলভ ব্যাখ্যা এ নাটকে পাওয়া যায়। একশ্রেণির অত্যাচারী প্রভঞ্জন- ত্রিভুবন; আরেক শ্রেণি অত্যাচারিত সর্দার- মংলা-রত্না-সঞ্চারিয়া। গণনাট্যকারেরা জানতেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিসংগ্রাম অনিবার্য। *দেবীগর্জন* সেই শ্রেণিসংগ্রামের নাটক এবং অবশ্যই গণনাট্য।

নাটকের ১৬ জন মুখ্যচরিত্রের ১৪ জনই গরিব চাষি। নাটকের ঘটনাবস্তু আবর্তিত হয়েছে জোতদার প্রভঞ্জনের ভাগ চাষিদের ধান ভাগ করাকে কেন্দ্র করে। ঋণের জালে বদ্ধ এই কৃষকেরা ২৫ মন ধান উৎপাদন করে কিন্তু ভাগে পায় এক মণ দশ সের। পশ্চিমবঙ্গে দু-দশক আগেও এই হিসাব চালু ছিল। ঋণ, চক্রবৃদ্ধি সুদ এবং তার উপর 'গোলামুছানি'

খামার খরচা- আরো কত কী যে ছিল। সামাজিক শোষণের ফলে কৃষকদের জীবনে দগদগে ঘা তৈরি হয়ে যায় এবং এ জ্বালা সহ্য করা অসহ্যকর হয়ে ওঠে। নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় প্রভঞ্জনের খামার বাড়িতে কর্জ শোধ করে কৃষকদের ধান নেবার প্রয়াস:

> *...এখানে ডাক অনুসারে কামিনরা বোরা ভরতি করে ধান মাপজোখ করছে। সঙ্গে সঙ্গে 'কিউ' ভেঙ্গে চাষিলোক এসে সরকারের কাছে টিপছাপ দিয়ে হিসেবমতো পাওনা- গন্ডা বুঝে নিয়ে যাচ্ছে।* (ভট্টাচার্য, ২০১৯:৪৮-৪৯)

চাষি সনাতন বাউরি টিপছাপ দেবার পর ধনাই বাউরি 'থমকে দাঁড়ায়'। কারণ গোটা ব্যাপারটা তার কাছে ঘোরতোর প্রতারণা বলে মনে হয়। কিন্তু প্রভঞ্জনের তৈরি কৃত জালে কপাল চাঁপড়িয়ে তাকে পাঁচটা বোরার চারটে শূন্য এবং আধবোরা ধান নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। গ্রামভারতের চিরপ্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক হিসাবের খেলায় পঁচিশ মণ ধান চাষ করে চাষির। ভাগে ঠেকে আধরোয়া, আর বাকিটা যায়- জোতদারের সাড়ে বার মণ, কর্জা ধানের সুদ নতুবা নতুন লাঙ্গল কেনার জন্য ধার নেওয়া টাকার সুদ। এভাবেই সুদের মারপ্যাঁচে হেরে যায় ধনাই বাউরির মতো কৃষক সম্প্রদায়:

> *ধনাই মুখঠো চাপলে বুকঠো ফাটে, ই আমি কি করি! ইস রে, পাঁচ মণটাক ধান ঘরে লিব ভাবছিলম রে, দুইটা মুনিষ আনছিলাম রে.....* (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৫০)

গ্রামবাংলার অধিকাংশ কৃষিজমি প্রকৃত চাষিদের হাতে না থেকে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দখলে ছিল। ফলে কৃষকেরা শোষণের শিকার হচ্ছিল এবং জমির ন্যায্য ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছিল। এই দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও অসন্তোষ থেকে কৃষক বিদ্রোহের পরিবেশ তৈরি হয়। স্বাধীনতার পর সরকার দরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৫৫ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার অধিনিয়ম' আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অকৃষকদের হাতে জমি সঞ্চয় রোধ করা এবং ভাগচাষ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা। তবে আইনটি পুরোপুরি কার্যকর না হয় কৃষকদের সমস্যা অব্যাহত থাকে এবং বিভিন্ন আন্দোলনের জন্ম হয়।

দেবীগর্জন নাটকে আইনের এই ফাঁক ফোকরে নিপীড়িত সাধারণ কৃষকের দুর্দশাকে তুলে আনা হয়েছে। অপরদিকে এই অন্যায়, বেআইনি হিসাবে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বাউরি সর্দারের ছেলে মংলা:

> *মংলা (গর্জে ওঠে) বে-আইনি সুদ দিব নাই। নামাই দাও পাথর, বন্ধ করি দাও মাপজোপ।* (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৫১)

মংলার এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না জোতদার সমাজ। তাই মংলার মাথায় লাঠি পড়ে। সেই সময় উপস্থিত হয় সামন্ত প্রভুর দোসর ত্রিভুবন সরকার। সে লোক দেখানো সমাজসেবী, আবার সে প্রভঞ্জনের পক্ষের লোক। অপরদিকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের প্রতীকী চিত্র দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে দেখা যায়। যখন বাটখারার পরিবর্তে মনাকে পাল্লায় চাপিয়ে তার বুকে পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়:

> *[প্রভঞ্জন উল্লাসে ফেটে পড়ে। আর মনা পাথর বুকে নিয়ে চেঁচাতে থাকে হাত-পা-ছুঁড়ে- 'আই দেখ, বাটখারা বানাইল দেখ, ই দেখ বাটখারা বানাইল দেখ]* (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৫৭)

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের দাবা খেলার মধ্য দিয়ে নাট্যকার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। গ্রামীণ জীবনে নিপীড়িত জনগণের মধ্যে নতুন পঞ্চায়েত গড়ে তোলার আওয়াজ উঠেছে, তাতে পুরনো পঞ্চায়েত মাতব্বররা বিচলিত। শুধু প্রভঞ্জন বিচলিত নয়। সে কোন পরিবর্তন করতেও রাজি নয়, কিন্তু ত্রিভুবন শোষণের পক্ষে থেকেও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা এই সংকট মোকাবিলা করতে চায়। দাবার রাজা-মন্ত্রী-গজ-বোড়ের চলাফেরার মাধ্যমে ত্রিভুবন এই নতুন যুদ্ধবার্তার শিক্ষা দিতে চেয়েছে সামন্তপ্রভু প্রভঞ্জনকে:

> *ত্রিভুবন (ধমক দেয়) প্রভঞ্জন! ই রকম খেলাটা তুমার সবঠাঁই, সবখানে, এই তো দেখলম তুমার হাঁতির খেলাটা খোলানের ময়দানে, কর্জ ধানের সুদের দায়ে আধিয়ারের মস্তকটা ফাঁড়ি দিলে তুমি লাঠিবাজি করি। আধিয়ারের রক্তে খোলানের মাঠ যদি না ভিজল তো কীসের দাপট তুমার? তারপর চাল দিয়েই বেচাল*

তুমি, ঘুরতি নিলে তুমি সে চাল,- আমাক পাঠাইলা ওই অতগুলান মারমুখী রুখী আধিয়ারের সাথ সমঝোতা করতে। (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৫৯-৬০)

লক্ষণীয় যে, ত্রিভুবন এই খেলার মধ্যে প্রভঞ্জনের যে একনায়কসুলভ ব্যবহার সে জন্য বারবার সতর্ক করেছে। যুগের পরিবর্তন, নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ইত্যাদির কবলে মহাজন, জোতদারদের একচেটিয়া শোষণের সুযোগ যে দ্রুত কমছে। শোষক শ্রেণির দাসত্ব করলেও পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী শোষণ পদ্ধতি বদল যে জরুরী এই কথাটি প্রভঞ্জনকে বোঝাতে সে ব্যর্থ:

ত্রিভুবন *হাঁতিঠো তোমার বড়ো বুড়া হইঁয়েছে প্রভঞ্জন, মন্ত্রীর মাথাঠো আমার অনেক উঁচা হে।*
প্রভঞ্জন *পাও দিয়া মন্ত্রীর মাথাতো দাবাই চলবে আমার হাঁতি শুণ্ডটা তুলি।* (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৫৯)

প্রভঞ্জন ভেবেছিল, তার সামন্ততান্ত্রিক হাতি নবীন গণতান্ত্রিক মন্ত্রীর মাথার উপর পা দিয়ে উঁচুতে শুঁড় তুলে চলতেই থাকবে। প্রভঞ্জন-ত্রিভুবনের আঁতাতের মধ্যে যে বিরোধের আভাস আছে, তার বীজ ইতিহাসে নিহিত আছে। সামন্তপ্রভু বা আদি পুঁজিপতিরা যে স্বেচ্ছাচারিতায় অভ্যস্ত ছিল, পরবর্তীকালে তাতে অন্য বিধিবিধানের চাপ পড়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আদি পুঁজিপতিরা মন থেকে নতুন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। প্রভঞ্জনকে নির্ভর করতে হয় সুযোগ সন্ধানী ত্রিভুবনদের উপর। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কৃষক- প্রজা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক মূলত পুরনো প্রভু ও প্রজা সম্পর্কেরই নতুন রূপ, যেখানে ক্ষমতার চাপ কৃষকদের ওপর পড়ে।

দাবা খেলার রূপক থেকে পরবর্তীতে তীব্র নাটকীয়তা দেখা যায়। বাউরি সর্দার ছেলের বিয়ের জন্য টাকা ঋণ চাইলে প্রভঞ্জনের নতুন চালে টিপছাপ নেওয়ার আনুষ্ঠানিকতার চিত্র দেখা যায়। প্রভঞ্জন গণতন্ত্রবিলাসী ভাবনায় বিশ্বাসী নয়, তাইতো সে তার শক্তি নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। আর সে খেলায় সে লোভের মোহ আর শক্তিমানের নগ্ন দাপট, উভয়ই চাল হিসেবে কাজে লাগায়। তাই মায়াবী কোমলস্বরে বাউরি সর্দারের থেকে সে সুদের টাকা দিয়ে টিপ ছাপ নিয়ে নেয়। এবং সর্দার সবটা বুঝতে পারে তবুও তার জালে আটকা পড়ে:

সর্দার দে-উ-নি-য়া!! (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৬২)

প্রভঞ্জনের চালে সর্দারের পরিবারের উপর নেমে আসে বিপর্যয়। ঋণের দায়ে সর্দার নিলামে জমিজোত খুইয়েছে। সর্দারের ছেলে মংলা গর্জে ওঠে। মংলা এবং তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী রত্নার সংলাপে এদেশে হতাশা মোচনের পথ হিসেবে জীবননাশ করার বিষয়টা যে ভ্রান্ত সেটি বোঝা যায়:

মংলা *আভাগ্যের দেশ, রেলগাড়িতে মেয়ে অনেক কেঁটেছে রত্না। কিন্তুক আমি যেঁইয়ে দেঁখছি, হুঁ হুঁ দেঁখছি- সেই রেলপাতের উপুর তার একটি দাগও নাই!* (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৭০)

মংলা দেশান্তরী হয় হতাশা ও কর্মহীনতায়। অনেক গরিব কৃষক পেটের দায়ে ভিটেমাটি ছেড়ে কয়লাখাদে কাজে চলে যায়। এ যেন সমাজ ব্যবস্থার এক নগ্নরূপ। সামন্তপ্রভুরা একচেটিয়া শোষণ করে গরীব চাষিদের উপর। অন্যদিকে শোষক শ্রেণির দোসর ত্রিভুবন বুঝতে পেরেছিল প্রভঞ্জনের এই একচেটিয়া একনায়কতন্ত্র এবং কৃষকের উপর এই অত্যাচার বেশিদিন চলবে না। তাই জোতদার প্রভঞ্জনের হিতাকাঙ্খায় তাকে বৈষ্ণব হবার সদুপদেশ দেয়।

ত্রিভুবন *বুলছিলম বুদ্ধির কথাঠো, আগেও বুলেছি, এখনও বুলছি- পঞ্চায়েতি শাসন তোমাক এখনই চালু করিবার হয়। কেন কী, অভাব আর অভিযোগের বহরঠো যে পরিমাণ বাড়ি যাঁইছে, তাত করি দায়িত্বটা তুমার নিজের উপুর রাখাটা আর উচিত হয় না জানিবে।* (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৮২)

কর্মপরিচয়ে ত্রিভুবন শ্রেণিচ্যুত; জন্মসূত্রে সে চাষি হলেও তার সহানুভূতি তাই জোতদারের দিকেই। এটা ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম। প্রথিতযশা সংশোধনবাদী চিন্তাবিদ মিলোভান জিলাস (Milovan Djilas) তাঁর "The New Class" গ্রন্থে এই নয়াশ্রেণির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন:

মানব ইতিহাসে দেখা গেছে বিগত দিনে শোষিত বঞ্চিত পরিবারের ছেলেরাই নয়া শোষক শ্রেণীর যেন সবচেয়ে স্থির সংকল্প, বিশ্বস্ত শরিক। ইতিহাসে দেখা গেছে ক্রীতদাসরাই তাদের মনিবদের হাতে তুলে দিয়েছে সব চেয়ে চতুর বিচক্ষণ, সব-জান্তা, অহং সর্বস্ব প্রতিনিধি, তাদেরই হাতে তুলে দেওয়া চাবুক চালাতে, তাদেরই শোষণের পথ প্রশস্ত করার জন্য। (মৈত্র, ১৯৮৪: ১১৭)

ত্রিভুবন এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার রূপ এবং নাটকের ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তি পরিচয়ের অন্তর্নিহিত শ্রেণিচরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে কখনো প্রভঞ্জনকে সতর্ক করে:

ত্রিভুবন *পরমাণুর যুগ চলেছে ইটা, পরমানুঠো এখন বড় প্রবল। তুমার সর্দারকে বুলে দিও ই কথাঠো।* (ভট্টাচার্য ২০১৯: ৫৪)

আবার সে চাষিদের সঙ্গ দেয়। তাদের সাথে একাত্ম হয়। সর্দারের দুঃখের দিনে তার দুঃখের গল্প শুনতে চায়। এই একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় পুঁজির বেতনভুক কর্মচারী ত্রিভুবন। সে আবার আচরণে 'জাতীয়তা ঠো' বজায় রাখে। আবার রাজনীতি তার পেশা, নির্বাচনী স্বার্থে সে 'ছোটলোকদের সঙ্গে যেমন মেলামেশা করে', আবার ব্যক্তিস্বার্থে সে প্রভঞ্জনকে উপদেশ দেয় পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থা চালু করতে। গোপনে সে উৎকোচও নেয়। ত্রিভুবনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার শ্রেণিচরিত্রের এক নগ্ন আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু প্রভঞ্জন ত্রিভুবনের এই উপদেশ মানতে চায়নি। সে শোষক ও অত্যাচারী জোতদার মহাজন। কর্জ ধানের জন্য সে আধিয়ারের মাথা ফাটিয়ে দেয়। সে কৃষকহত্যার স্বপ্ন দেখে। অহংকারী প্রভঞ্জন তাই তীব্র ভাষায় বলে:

প্রভঞ্জন *আমি রাজা, আমারই নীতি- ইটাই রাজনীতি।* (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৮৩)

তার একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব ও আধিপত্য বিস্তারের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বাসনা প্রকাশিত হয়। আর্থিক শোষণই নয়, প্রভঞ্জনের কামনা-কুটিল দৃষ্টি চাষিদের শ্রীহীন অন্দরমহল পর্যন্তও শঙ্কা সৃষ্টি করেছিলো। বর্ষীয়ান সর্দারের নবযৌবনা পুত্রবধূ তারই খোলান থেকে হলো নিরুদ্দিষ্টা। নাটকের একটি অংশে দেখা যায় প্রভঞ্জন লাঠিয়াল দিয়ে অপহরণ করে মংলার বউ রত্নাকে। এবং ক্ষমতার বলে প্রভঞ্জন রত্নাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা চালায়। গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষক, বর্গাদার, খেতমজুরের উপর জোতদার শ্রেণি এভাবেই শোষণ করেছে। এবং শোষণের বীভৎসতা ফুটে উঠে সর্দারের সংলাপে:

সর্দার *আর ভাব যদি মেয়েটার একটা বিপদ হয়, সাঁপে কাটে, কি বাঘে নেয়?*
... হাঁকাড় দিঁছে আর কুঁয়াত করি ফিরছে চক্কর দিয়া দিয়া। আজ আমার ঘর, কাল তার ঘর- সকল সংসারে নুলা বাড়াইছে, কলজ্যার ভিতর নলি ডুবাই রক্তমাখা থাবাটো চাটতে লেগেছে... (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৮৫)

তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকার গণনাট্যের সংগ্রামের নতুন রূপরেখা আঁকলেন। দেখালেন ভূস্বামি- মহাজনদের আক্রমণ যখন সর্বগ্রাসী, তখন গ্রামের পর গ্রাম সংঘবদ্ধ হতে হবে। এ নাটকে ভিন্নগ্রাম থেকে এসেছে সঞ্চারিয়ারা। তারা এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য নিজেদের তৈরি করেছে। সঞ্চারিয়ার কথায় সেই অগ্নিস্তুপ এর আভাস মেলে:

সঞ্চারিয়া *... তাই ধরমগোলার আজ ধরমনাশ হঁইয়েছে। লক্ষীর ঝাঁপিঠো নুলা দিয়া টানি লিছে শয়তান- ইটার একটা ফয়সালা দরকার।* (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৮৯)

জাগ্রত মানবাত্মা অবশেষে বাঁচার পথে এগিয়েছে। বাঘের চোখে যখন চোখ পড়েছে তখন ডরালে বাঁচা যাবে না, "উঠাও না কেনে টাঙ্গিটাক?" সঞ্চারিয়ার এই আহবানে আর সকলেও দাঁড়িয়ে উঠেছে যুগপৎ। এর পূর্বেও বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সময় থেকে শোষিত হচ্ছে কৃষকসমাজ। তারা দীর্ঘ দেড়শো বছর এই শোষণ- নিপীড়ন মেনে নেয় নি। ইতিহাসে তাদের সেই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের কথা রয়েছে। তিতুমীরের ফরাজী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, বরদলৈ কৃষক সত্যাগ্রহ, পুনার কৃষক অভ্যুত্থান, পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সমকালে তেলেঙ্গানার

কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা লড়াই- এই কৃষক জাগরণেরই বিস্তারিত সম্প্রসারণ। ভারতীয় কৃষকদের এই দুর্দশাপূর্ণ জীবনের দুঃখময় অবস্থা বর্ণনায় এড্‌উইন মারখা লিখেছেন:

তাদের হাতে নিড়ানি, মুখে যুগযুগের শূন্যতা, এবং পিঠে সমগ্র বিশ্বের বোঝা। (রামস্বরূপ, ১৯৫৪: ১৮৬)

আবার সময়ের তালে এই কৃষকেরা হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী, প্রতিবাদ করেছে নিজেদের ভাষায়। তাই সঞ্চারিয়া ও মংলার নেতৃত্বে যখন জোটবদ্ধ চাষিরা পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থার ধ্বনি তোলে সেই অগ্নিমুহূর্তকে স্তিমিত করতে চেয়ে ত্রিভুবন জাল বিছিয়েছে বাঘবন্দী খোলার পুরনো পঞ্চায়েতের সভার ব্যবস্থা করে। সে তার কথার জালে, যুক্তি-তর্কে এই অসহায়, সরল কৃষকদের ফাঁসাতে চেয়েছে। কেউ কেউ তাকে বিশ্বাস করেছে আবার কেউ বলেছে:

সমস্বর 'গুল দিছে- 'মিথ্যা বুলছে- চাপি বসেন মশায়! (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৯৮)

জনতা যখন আয়ত্তের বাইরে তখন ত্রিভুবন প্রভঞ্জনকে বেনামী জমি প্রজাস্বত্ব মতে বন্টন করতে উপদেশ দিয়েছিল। ১৮৮৫ সালে প্রবর্তিত এ আইন আলোচ্য নাটক রচনা কালেও চালু ছিল পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৬৫ সালের পহেলা নভেম্বর থেকে এই আইন নিয়মিত বা সম্পূর্ণভাবে রদ করা হয়। এই প্রজাস্বত্ব আইনে 'প্রজা' বলতে বোঝায় খাজনা দিতে বাধ্য এমন ব্যক্তিকে। প্রভঞ্জনের মতো বহু মধ্যস্বত্বভোগীর ফুলে ওঠার সহায়ক ছিল এই প্রজাস্বত্ব আইন। এই আইনে ১০০ বিঘার বেশি জমি রাখা যেত ব্যক্তিগত মালিকানায়। ভূমি বিশেষজ্ঞের ভাষায়- "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল হিসাবে যে মধ্যস্বত্ব ভোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে তা ক্রমশ প্রজাস্বত্বের সর্বস্তরের ছড়িয়ে পড়ে ভূমি আইন বা রেগুলেশন বিধির প্রশ্রয়ে।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৩: ১২৫-১২৬)

প্রভঞ্জন হল এই ভারতীয় মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির বিশ শতকীয় প্রতিনিধি। তার চরিত্র গড়ে উঠেছে মোগল জায়গিরদার, মহাজন বা ব্রিটিশ জমিদারের শ্রেণি বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রনে। ভারতবর্ষের গ্রামীন অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ শক্তি যাদের হাতে, সেই শ্রেণির আধুনিক সংস্করণ প্রভঞ্জন। তার একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা লাভ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে সাময়িকভাবে তা সম্ভব ছিল না। সে কৃষকের ধান গুদাম করে রাখে, তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে:

প্রভঞ্জন — *হু পারতম, যদি সে সুবিধা পাইতম। তামাম ধান গুদামজাত করি যদি খুশীমতো ছাইড়বার- পারতম বাইরের অন্ধকারে আক্রারার বাজারে। কিন্তু এখন বাঁধা দরে ছাড়তে হবেক ধান সূর্যসাক্ষী করি, একটা পয়সার সুবিধা নাই।* (ভট্টাচার্য, ২০১৯:৫৬)

ধান গুদামজাত করে বেশি মুনাফা করতে না পেরে প্রভঞ্জনের আফসোস এই সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বকেই প্রকাশ করেছে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হলেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল একচেটিয়া পুঁজির হাতে। সরকার কৃষক ও গ্রামীণ সমাজের কথা বললেও তাদের নীতি জমির মালিক ও ধনী কৃষকের স্বার্থেই কাজ করেছে। ছোট কৃষকদের জন্য নেওয়া সংস্কার গুলি মুক্তির জন্য নয়, শোষনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য। ফলশ্রুতিতে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মুক্তি ঘটেনি, শুধু শোষকের রূপ বদলেছে।। সৃষ্টি হয়েছে বৃহৎ ভূস্বামী বনাম একচেটিয়া পুঁজির দ্বন্দ্ব। একচেটিয়া পুঁজির বেতনভুক ত্রিভুবন একদিকে এই গরীব চাষীদের ক্ষ্যাপায় আবার প্রভঞ্জন কে আপোষ করার উপদেশ দেয়। যদিও 'রাষ্ট্র' আপাত অর্থে প্রগতিশীল, কিন্তু দুই শ্রেণিরই লক্ষ্য কৃষকশোষণ।

স্বাধীনতার পর দেশের সংবিধানে সব নাগরিকদের সমান মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বহু শতাব্দীর জমিদারি ব্যবস্থার অভিশাপ আইন বন্ধ করা হয়। কিন্তু বদলায় নি শুধু কৃষকদের ভাগ্য। তাইতো মংলার মনে চেতনা জাগে- ' কে রাজা, কার রাজ্য?' (ভট্টাচার্য, ২০১৯:৪৬)। সমবেত সাঁওতাল কৃষকেরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় কৃষিঋণ আর কর্জাধানের সুদ তারা প্রভঞ্জনকে না দিয়ে সরকারি কাছারিতে জমা দিবে। ধর্মগোলার মজুত ধান অভাবের দিনে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার দাবি জানায় তারা। প্রভঞ্জন এতে রাজি হয় না:

ধর্মগোলা'! এগিয়ে এসে রুখে দাঁড়ায় প্রভঞ্জনের লাঠিয়াল দল, লাঠিতে লাঠিতে মোকাবিলা হয়, কিন্তু উন্মত্ত জনতার আক্রমণের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় প্রভঞ্জনের প্রতিরোধ- শক্তি। (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ১১২)

এই প্রবল কৃষক বিদ্রোহের সামনে তৃণ খণ্ডের মত ভেসে যায় প্রভঞ্জন। নাটকের শেষ দৃশ্যে প্রভাঞ্জনবধ যেন পৌরাণিক মহিষাসুর বধের নব রুপায়ণ। অপরদিকে পালিয়ে যায় তার দোসর ত্রিভুবন।

দেবীগর্জন নাটকের ভাগচাষি আধিয়ার প্রজা, ছিন্নমূল রায়তের সংগঠিত প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ দেখানো হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে নাটকের এই কৃষকবিদ্রোহ পরিপূর্ণভাবে সঙ্গতিসূচক। তৎকালীন ভারতবর্ষের এই অঙ্গরাজ্যে কৃষকের রক্ত- জল করা উৎপাদনে অসংখ্য জমিদার জোতদার ফুলে ফেঁপে উঠছিল। তার উপর ছিল সুদখোর মহাজনশ্রেণি। মধ্যস্বত্বভোগীরা আত্মসাৎ করে নিচ্ছিল কৃষকদের উৎপাদনের একটি বড় অংশ। এই প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হচ্ছিল শ্রেণিদ্বন্দ্বের। শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে দেয়ালে পিঠ ঠেকা মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছিল দিকে দিকে।

গণনাট্যের নাট্যকারদের কলমে শ্রমিক- কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের কথা উঠে এসেছে। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর এই *দেবীগর্জন* নাটকে মার্কসীয় চেতনার আলোকে সর্দার- মংলা- দশরথ- সঞ্চারিয়ার মত সর্বহারা কৃষকদের জোতদার শ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি সাধারণ কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির জীবনের সংগ্রামকে উপজীব্য করে তাদের অধিকার আদায়ের লড়াইকে তুলে ধরেছেন, যা মার্কসবাদী মতবাদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। নাট্যকার এই নাটকটির মাধ্যমে গণনাট্য আন্দোলনকে মার্কসীয় চেতনায় যেমন জোরদার করেছেন তেমনি বাংলার কৃষক সমাজের মুক্তির পথটিও দেখিয়েছেন। চন্দন খাঁ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

আমাদের দেশের অসংগঠিত কৃষক- সমাজ সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে বিপ্লবে শামিল হলে একদিন স্বপ্নের ভোর আসবেই। কম্যুনিস্ট বিজন বাবুও এই স্বপ্ন পথের অভিযাত্রী ছিলেন। তাঁর এই স্বপ্ন কিন্তু রোমান্টিক কল্পনাবিলাস নয়, এই স্বপ্নের মধ্যে মিশে আছে ঘাম, অশ্রু আর রক্তের নোনতা স্বাদ। কোন পথে কৃষক মুক্তি সম্ভব, নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই দিক- চিহ্নটি আলোচ্য নাটকে তুলে ধরেছেন। (খাঁ, ১৩৯৭: ২২৯)

দেবীগর্জন নাটকে শ্রেণীসংগ্রামের পাশাপাশি বিজন ভট্টাচার্য বাংলা লোকনাট্য, লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম দেখিয়েছেন। কাহিনির শুরুতেই বাউরি, সাঁওতাল, কুলি-কামিন ছেলেমেয়েরা আলো হাতে লাইনবন্দী কাজে চলেছে গান গাইতে গাইতে:

হাতে মগের বাতি মাথাত বেতের ঝুড়ি,
চলিলাম দাদা গ পাতালপুরী।
চোখেতে ঘুম ঘুম পায়েলা রুমঝুম
সুমরি শুকরি যাঁইছে পাতাল নিঝুম।। (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৪৩)

মংলা-রত্নার বিয়ের অংশ যেন আদিবাসী বিবাহ- আচারের সুন্দর পরিচয়। লোকনৃত্যগীতের প্রয়োগ, বাসর ঘরে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত রূপকথার প্রসঙ্গও এসেছে:

মংলা ... তুই আমার কাঁধঠোয় চাপি বসেক, আমি পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটাইতাম। রাক্ষস্ আর খোক্ষস্ পুরীর ভিতর দিয়া উড়াল দিতম যক্ষপুর। (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৬৫)

নাটকে বহুরূপীর দলের কথা বলা হয়েছে। যারা লোকজীবনের আনন্দ, উৎসবে হাজির হয়। দেবীগর্জনের শেষাংশে বহুরূপীর দল সেই ভূমিকা পালনের সঙ্গে কৃষক সংগ্রামেরও অংশীদার হয়। এছাড়া লৌকিক ক্রীড়া হিসেবে দাবা খেলার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। মহাভারত- হিন্দুপুরাণ- বৌদ্ধপুরাণ- চর্যাপদ এই পৌরাণিক ক্রীড়া এখানেও রয়েছে। প্রভঞ্জন এবং ত্রিভুবনের ভবিষ্যতের কৌশলগত বিরোধের পটভূমি তাদের এই লোকক্রীড়ায় আভাসিত হয়। এছাড়া সমাজে প্রচলিত ধর্মীয়

কুসংস্কার পাওয়া যায় গিরি যখন তার পুত্রবধূ রত্নাকে অপয়া ভাগ্য বলে। এছাড়া রত্নার কিছু কিছু সংলাপে কুসংস্কার ও গ্রাম্য প্রবাদ পাওয়া যায়।

প্রভঞ্জন কতৃক লাঠিয়াল দিয়ে রত্নাকে অপহরণের ঘটনা সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার নির্দেশ দেয়। যা যুগ যুগ ধরে লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। এছাড়া এখানে লৌকিক ছড়া ও প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কামিনেরা কুলোয় শস্য প্রস্তুত করতে করতে শ্রমসংগীত হিসেবে ছড়াগান করছে। নাটকের সংলাপে সাঁওতালী আদিবাসী ভাষা ব্যবহার করেছেন নাট্যকার:

গিরি *আঁই দেখ, সাদি দিব ছেল্যাটাক তা পয়সা খরচা হবেক নাই?- মজাঠো কেমন হয় বটে,- টুকচা বউ ঘুরঘুর করবে, ধান ভাঙবে, তোকে হাঁড়িয়া দিবে...* (ভট্টাচার্য, ২০১৯: ৪৭)

নাটকের শেষ দৃশ্যে বহুরূপীর দলকে দশরথ রক্ততিলক পরায় এবং তাদের লোকিক বৃন্দগান করে। এই লাল রং বিপ্লব-বিদ্রোহের চিহ্ন। আসন্ন কৃষক বিদ্রোহের কথা মনে রেখে, লোকশিল্পীদের ললাটে রক্ত তিলকের ব্যবহার নাট্যানুগ।

দেবীগর্জন নাটকটির নামকরণের ক্ষেত্রে দুটো ধারণা পাওয়া যায়- একটি লোকায়ত অর্থে, অপরটি পৌরাণিক অর্থে। নাটকের শেষ দৃশ্যে মহিষাসুর বধ এবং মহাকালী তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে কৃষকদল কর্তৃক প্রভঞ্জনকে হত্যা পুরাণকে সমকালের পটে স্থাপনের পদ্ধতি বলা যায়। নামকরণের ক্ষেত্রে যে অর্থই থাকুক না কেন- ঊষর লালমাটির দেশ বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষীদের কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় শত্রুকে পরাজিত করে, জননীকে খুঁজে পাবার সংগ্রামী সাধনায় *দেবীগর্জন* নাটকটি নামের দিক থেকে সার্থক।

৫.০ ফলাফল ও ব্যাখ্যা

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নাটকের চিরায়াত ঐতিহ্য থেকে সরে এসে গণনাট্যের পটভূমিকায় সাধারণ গণমানুষের জীবন ঘটিত সমস্যা, বাস্তবতা, মাকর্সীয় দর্শন ও শ্রেণিসংগ্রাম তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন। *দেবীগর্জন* নাটকেও এই একই সুর দেখা যায়। এই নাটকে নির্যাতিত-নিপীড়িত, সাঁওতাল আদিবাসীদের লোকায়াত জীবন-ব্যবস্থা এবং এদের উপর জোতদার, মহাজন ও সামন্তপ্রভুদের অত্যাচারের চিত্র যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনিভাবে এই সর্বহারা শ্রেনির প্রতিরোধ-প্রতিকারের চিত্রও রয়েছে। জমিদারি-প্রথার বিলোপ-সাধনের পর মধ্যস্বত্বভোগী প্রভঞ্জনের একচেটিয়া শাসন-শোষনের যাঁতাকলে পিষ্ট সাঁওতাল কৃষক মংলা-সঞ্চারিয়ারা গর্জে ওঠে নিজেদের অধিকার ও ভাগ বুঝে নেওয়ার লক্ষ্যে। তাদের প্রবল গণজাগরণের মুখে পরাজিত হয় এই শোষকশ্রেণির প্রতিভূ। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার বিসর্জনের তালে তালে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় দেবীগর্জন। বিজন ভট্টাচার্য নাটকের সমাপ্তিতে 'জোটবদ্ধ প্রতিরোধ এবং সর্বহারা শ্রেণির বিজয় দেখিয়েছেন।

৬.০ উপসংহার

সর্বোপরি বলা যায়, গণনাট্য আন্দোলন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি করে, এই আলোড়নের প্রাণপুরুষ ছিলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর রচিত নাটক সমূহ ছিল গণনাট্য আন্দোলন পরিচালনার হাতিয়ার স্বরূপ। শুধুমাত্র নাটক রচনা নয়, অভিনয়ের মাধ্যমে ও গণনাট্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। পাশাপাশি *দেবীগর্জন* নাটকের মত একাধিক নাটক নির্মাণের মাধ্যমে নাট্যসাহিত্যে এনে দিয়েছেন নতুন নাট্যাঙ্গিক। তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গণনাট্য আন্দোলন এবং বিজন ভট্টাচার্যের নাটক সম- মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

৭.০ গ্রন্থপঞ্জি

খাঁ, চন্দন. (১৩৯৭ বঙ্গাব্দ). *দেবীগর্জন : পুনর্মূল্যায়ন.* কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী.

ঘোষ, ড.অজিত কুমার. (২০০৩). *বাংলা নাটকের ইতিহাস* (৮ম সংস্করণ). জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.

চৌধুরী, দর্শন. (১৯৯৫). *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস.* কলকাতা পুস্তক বিপনী.

চৌধুরী, দর্শন. (১৯৯৭). *গণনাট্যের নবান্ন: পুনর্মূল্যায়ন.* বামা পুস্তকালয়.

চৌধুরী, দর্শন. (২০১৬). *বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ.* বিশ্বনাথ রায় ও ছন্দা রায় (সম্পা.) কলকাতা. ISBN 978-93-85119-58-3.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক. (২০১৯). *দেবীগর্জন.* বিজন ভট্টাচার্য. মাটিগন্ধা. বাংলাবাজার. ISBN 984-70343-0089-5.

বন্দ্যোপাধ্যায়,তারকনাথ. (১৯৮৩). *পশ্চিমবাংলার ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্ব'* .পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ.

ভট্টাচার্য, বিজন.(২০১৯). *দেবীগর্জন* (১ম সংস্করণ). মাটিগন্ধা. ISBN 984-70343-0089-5.

মৈত্র,কাশিকান্ত. (১৯৮৪). *'মার্কসবাদ: কৃষক ও কৃষিনীতি.* গীতাঞ্জলি প্রেস.

রামস্বরূপ, (১৯৫৪). *কমিউনিজম ও কৃষক.* প্রাচী প্রকাশন.

রায়, ড. শেখর. (২০১২). *বাংলা নাটকের বিবর্তন.* সমাচার (১ম সংস্করণ). বাংলাবাজার. ISBN 984-70182-0109-5.

রায়, ড.মন্দিরা. (২০০৪). *গণনাট্য এবং নবনাট্য একটি বিতর্ক.* কলকাতা: বামা পুস্তকালয়.

৮.০ গবেষক পরিচিতি

সাদিয়া সুলতানা (Sadia Sultana)
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
ওয়ার্ল্ড ইনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
ই-মেইল: sadia.sultana@science.wub.edu.bd